হৃদয়ে একাত্তর

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

ভয়ংকর বিভীষিকাম একাত্তুরের কত স্মৃতি লুকিয়ে আছে অন্তরের গভীরে, কোনটা আগে আর কোনটা পরে লিখবো বুঝতে পারছিনা। একাত্তুরের ২৫ মার্চ রাতে অন্ধকারে পাকিস্তানের অস্ত্রবাহী জাহাজ থেকে অতর্কিত গোলাবর্ষণে চট্টগ্রামবাসী আতংকিত ভীত সন্ত্রস্ত। অনেকে তখন রাতের খাবার খাচ্ছিলেন বা দেরী করে ঘরে ফেরা যুবকসন্তান ওস্বামীদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। মেহেদীবাগের নিজ বাড়ীতে শ্বশুর-শ্বাশুরী, স্বামী-সন্তানের রাতের খাবার দিয়ে সেজো ভাই গোলাম মোস্তফা সাজুর জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছি। মেজো ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইতিহাস বিভাগে অনার্স ফাইনাল দিয়ে অপেক্ষা করছে ভাইভা দিতে। তার জন্যও চিন্তার অন্ত নেই। ফিরতে এত দেরী করছে কেন সাজু? সাধারণত: এমনতো করেনা। সাজু, করিম, লজিক সাহেবদের (মার্কসবাদী) মেসে বসতো আড্ডা দিতে। ড্রাইভারকে পাঠালাম ডেকে আনতে। সাজু আসলে ভাই-বোন একসাথে খেতে বসি। মোস্তফা বলে, সে ও তার বন্ধুরা লজিক সাহেবের মেসে মরিচের গুড়ো দিয়ে ককটেল বানাবে। তার জন্য যেন চিন্তা না করি। সে ফিরতে ভোর হবে এবং দুলা ভাই এর সাথে সকালে নাস্তার টেবিলে সামিল হবে। সবাই সাবধানে থাকবেন। আজ শহরের অবস্থা ভীষণ থমথমে। শোনা যাচ্ছে, জাহাজ থেকে অস্ত্র নামবে। রাজনৈতিক মতৈক্যের অভাব, বাঙালির ললাটে কি আছে বলা যায় না। নিরস্ত্র বাঙালি আর অস্ত্র নিয়ে জাহাজ নোঙর করে আছে চট্টগ্রাম বন্দরে। অজানা ভয়ে শংকিত, জীবনযাত্রায় অদ্ভুত শীতলতা, উদ্যমহীনতা কাজ করছে। মেজ ভাই মোস্তফাকে সামনের দরজা বন্ধ করার নাম করে বের করে দিলাম ঘরের বাইরে, ককটেল বানানোর জন্য। শহীদ মির্জা লেইনের টগবগে যুবকরা অতর্কিতে আক্রমণের প্রতিরোধ গড়ার মহড়া, বন্দুক চালানো শিক্ষা নিতে ব্যস্ত। আমরা কতিপয় মহিলা নিজাম রোডে এলিট পেইন্ট এর মালিক সিরাজ সাহেবের খালি জমিতে জড়ো হতাম। ফাষ্ট-এইড শিক্ষা থেকে বন্দু চালানো শিখতাম। বন্দুক চালানো শিখাতেন মাওলা সাহেব (রুবী প্লাইউড এর ম্যানেজার) তার স্ত্রীসহ আমি, রেবা, নীলুফার ও অনেকে। সেবার কাজ মেয়েদের। প্রফেসার মশিহুর রহমান তৎকালীন গাইনী বিভাগের হেড। উনি রক্ত বন্ধকরা ও ব্যান্ডেজ করা শিখাতেন। সেই উদ্দীপনাময় সময়ে অতর্কিতে গর্জে ওঠা পাকিস্তানীর বর্বর আক্রমণাত্মক ঘটনায় আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লেও ফোনে খবরাখবর দেয়া নেয়া চলে। ঢাকা থেকে তৎকালীন এটর্ণী জেনারেল ফকির সাহাবুদ্দিন সাহেব সিরাজ ভাইকে ঢাকার পরিস্থিতি জানাতেন। রেবা (এলিট পেইন্ট এর মিসেস সিরাজ) সেই খবর আমাদেরকে দিতেন। ঢাকার খবরাখবরের জন্য রেবাকে ঘন ঘন ফোন করতাম। ঢাকার দিকেযে আমরা উনমনা হয়ে চেয়ে

ভাইয়ের জন্যে কিশোরী এক বোনের অন্তহীন অপেক্ষা

আছি, আমাদের ভবিষ্যৎ-এ কি নির্ধারিত হচ্ছে তা জানার জন্য। শেখ সাহেবের খবর মানে পাকিস্তানীদের সাথে বৈঠকের খবর-আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে– তা কি হচ্ছে অধীর আগ্রহে রেডিও বুকে গৃহ কর্ম করছি। ২৫ মার্চের গোলা বর্ষণের সময় স্বপরিবারে দোতলার সিঁড়ির নিচে অবস্থান করি, কোলে চার বছরের মেয় ঝুমা। চারদিকে ঠাসাঠাসি করে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। ভয়ে কুকুর টমিও সিঁড়ির দরজার বাইে রবসে কুঁউ কুঁউ করে শোকার্ত ও ক্ষীণ স্বরে ডেকে তার অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছিলো। আমার তেরো বছরের ছেলে জাফরী তার প্রিয় কুকুরের জন্যে দু৷খে কাঁদো কাঁদো। এদিকে সদ্য হজ্ব ফেরা শ্বাশুরী ঠক ঠক করে কাঁপছেন। আর জানতে চাইছেন ও কিসের শব্দ? মোস্তফা কোথায়? আমাদের মা নেই, মনে হলো মা তার সন্ত ানের খোঁজ করছেন। চিরকালের মমতাময়ী মায়ের আকুতি ঝড়ে পরে আমার শ্বাশুড়ির কণ্ঠে। দরজা খুলে কি দেকভো, ভাইটাতো ছিলো ঘরের বাইরে। কাঁপা কাঁপা হাতে সামনের দরজা খুলছি। পথঘাট জনশূন্য, তার মাঝেও চোখে পড়লো কয়েকজন বয়স্ক পড়শী, ঘরে না ফেরা সন্তানের কোঁজে বের হয়েছে এরা। ২৭ মার্চ বিকেলে মেহেদীবাগ ছেড়ে দক্ষিণ নালাপাড়ায় বড় খালু মাহবুবুল হক সাহেবের বাসায় চলে গেলাম। খালা-খালু বারবার ফোন করছেন। বিপদের দিনে সবার একত্রে থাকা দরকার। বিচ্ছিন্ন থাকলে বিপদের সম্ভাবনা বেশী। তাছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে ৬/৭ টা পরিবারও এসে উঠেছে এখানে। আমরাতো ওদের আপনজন। আমার সন্ত ানদের নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন। বুড়ো শ্বশুর-শ্বাশুরীর কথা ভেবে যেন আর দেরী না করি। নতুন ভাত খাবো তবুও একত্রে াকবো। একত্রে াকার সুবিধা সহজে সংঘবদ্ধ হওয়া, সহজে একত্রে কাজ করা যাবে ইত্যাদি। জোর তাগাদার মুখে নিজ ঘর বাড়ি সংসার ছেড়ে, পামের বাড়ির উর্দু ভাষীদের উগ্র যুবক ও মধ্যবয়সী কয়েকজনের অহেতুক সর্দারীপনা দেখে ছোট বোন শেফালী, বড় মেয়ে মুন্নী, মেজ মেয়ে সুবা ওদের কা ভেবে মাত্র কয়েকটা কাপড় নিয়েই মেহেদীবাগ ত্যাগ করি। হীলম্যান ৫৬৫ নং গাড়ীটায় ৯ জন মানুষ কেমনে বসলাম জানিনা। সেই ভয়ংকর সময় চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ছিলেন জনাব খোরশেদ আলম। এস, পি ছিরেন সামছুল হক ভাই, রহমানের সাে মাঝে মাঝে তাস খেলতেন, সান্ধ্যকালীন আড্ডায়। চিটাগাং ক্লাবেও একসাথে আড্ডা হতো। এই সরকারী কর্মকর্তা দুইজনেরই পরিবার আমার দোতলায়। পরিবার মানে স্ত্রী ও সন্তানদের নিরাপদ স্থানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমি নালাপাড়া রওয়ানা হওযার আগে এস,পি, সামছুল হক ভাইযের বাসায় ফোন করলে অচেনা গলায় একজন ফোন করে বলে এস,পি, সাহেব টহলে গেছেন। ক্যাপ্টেন রফিকের বাসায় ফোন করলেও শুনতে পাই সাহেব ডিউটিতে গেছেন। ডিসি খোরশেদ ভাই এর স্ত্রী সালমা ভাবীর সাথেও কথা হলো না। ফোন শুধু এনগেজড। সালমা ভাবীর মেয়ে কণা ও কাকলীর জন্যেও মন টন টন করে লাগলো। কণা,কাকলী ছিল আমার ঝুমুর সতীর্থ। একই স্কুলে পড়ে। সেন্ট মেরিস স্কুল। একসাথে থাকলে ভালোই হতো। শ্বশুর মশায়ের বার বার হাঁক ডাকে অশ্রু সম্বরণ করে যাত্রা করলাম বুয়াকে কোলে বসিয়ে। ভীষণ আঁট-সাঁট দম বন্ধ অবস্থায় গাড়ীতে। নালাপাড়া থেকে ৭ এপ্রিল বাপের বাড়ী চৌদ্দগ্রাম থানার সোনাপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। খালুদের বাসায় পরিবারের মায়ের চাচাতো ভাই মার্শাল সিরাজ এর পরিবার ও তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, শালা শালীর বড় দুইটা পরিবার ৩টা গাড়ি এবং মটর সাইকেল এর এক কাফেলা

নিরাপত্তার খোঁজে চট্টগ্রাম ছেড়ে সবুজ বনানী ঘেরা গ্রামের পথে চলেছে। মেয়েদের জন্যই সবাই চিন্তিত। হায়ানার রূপ তখনও উন্মোচিত না হলেও তার বিভৎসতার ভয়তো আছে। পাহাড়তলী টেক্সটাইলের কাছে রাস্তায় আগুণ জ্বলছে, এটা বিহারী এলাকা। ওদের নামকরা কলোনী, তারা রাস্তায় টহল দিচ্ছে। হাতে কিরিচ, লেদারের বেল্ট নিয়ে আর পৈশাচিক উল্লাসে গাড়ি চেক করছে আর বলছে "শালা বাঙালী ভাগতা হ্যায়।" আমাদের গাড়ি থামাতেই পাশে এসে থামলো রহমানের উর্দু ভাষী মক্কেলদের চারজন। তারা উগ্র বিহারীদের বললো "ছোড় দো ইহে হাম লোগোকা উকিল সাহাবকা ফ্যামিলি গাঁও যাতা হ্যায়। উনকা ওয়ালেদ হজ্ব কারকে আয়া। ছোড় দে ইস লোগোকা।" সত্যি ওরা অনুমতি দিলে আধা নেভা আগুণের মধ্যে একটা মাইক্রোবাসের ছিনে আমাদের গাড়ি ছুটলো। গাড়িতে বসেও আগুণের আঁচ পেলাম। ফৌজদারহাট পেরিয়ে একটু হাফ ছেড়ে বসলাম। কুমিরার কাছে এখানে কাশেম মাষ্টারের লোকজন শহর ছাড়া যাত্রীদের থামাচ্ছে। ঘটনা শুনতে চাইছে। পানি খাওয়াচ্ছে। ওরা তো আপনজনের চেয়ে কম নয়। পরম সহায়তাকারী।

কুমিরা সিরসরাই পেরিয়ে সীতাকুন্ড বাজার পেরুতে দেখলাম রাস্তায় শাক সবজি ও অকালের টমেটো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বেচতে না পেরে অবিক্রিত সব ছেড়ে ঘরে ফিরছে। হ্যাঁ, গতকাল ৬এপ্রিল সীতাকুন্ড বাজারে বোমা হামলা হয়েছিল। তার স্বাক্ষন বহন করছে এই লন্ড ভন্ড বাজারে ছড়িয়ে থাকা সীম, বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় আমরা এগিয়েযাচ্ছি ফেনীর দিকে। গতকাল ফেনীতেও বোমা পড়েছে। ফেনীতে ঢুকতে সন্ধ্যা ৭ টা বেজে গেলো। অন্ধকারে একদল বন্দুকধারী যুবক সাদা হীলম্যান গাড়িটা আটকালো। পান্‌জাবী পালাচ্ছে। চিৎকার করে কাছে এলো। বন্দুক উচিয়ে একটা ছেলে বললে হলট॥ গাড়ি থামান। চেক করবো, আমি দরজার কাছেই বসেছিলাম। বন্দুক হাতের ছেলেটা আর কেউ নয়

যুদ্ধের দিনগুলোতে দলে দলে এভাবে সকলে শহর ছাড়ছিল

আমার মেজ ভাই সাই আহমদ, ঢাকা ভার্সিটির ইতিহাসের শেষ বর্ষের ছাত্র। পঁচিশ মার্চের পর যার খবর পাচ্ছিরাম না। ফোন করে ক্লান্ত হয়েছি, চিন্তিত হয়েছি। সেই ভাই ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের ছাত্র, রণকৌশল জানা। বন্দুক চালানোর ট্রেনিং সেই স্কুল জীবন থেকেই, সে এখন মুক্তিযোদ্ধা। কতো চুইংগাম নিতে হতো ওর ভিজিটিং ডেতে। সেই দুরন্ত সাইদ খাকি ১টা ড্রেস পরা ও বন্দুক উঠিয়ে বলছে 'হলট'। দেকে হুহু কান্না পেল। ওর নির্দেশে ছেড়ে দেয়া হলো আমাদের। মাষ্টার পাড়ায় সেজো খালার ভানু ভিলায় রাতের আস্তানা নিলাম। ওমা গিয়ে দেখি খালাম্মা নেই। তার শ্বশুর বাড়ি ধনিকুন্ডা গ্রামে গেছেন, স্বপরিবারে। তবে ওনার ২ ছেলে ও সেলিম ভাই সবাই তাস খেলছে। আমাদের পেয়ে বেজায় খুশি হলো। বললো মার অনেক মুরগি আছে, এক্ষুনি জবাই করছি, আপা রাঁধবেন। সেদিন মজা করে সবাই খেলাম। সকালে পথঘাটের খবর নিয়ে নাস্তা সেরে নয়া রিকশা নিয়ে তিন পরিবারের গ্রাম যাত্রা। আমার গাড়ি মাষ্টার পাড়ায় ভানু ভিলায় খালার গ্যারেজ রেখে যাত্রা করলাম রিকশায়।

দুইদিন পর ড্রাইভার এসে গাড়িটা গ্রামে নেবে। তার বাড়ী গুণবতী। দুইদিনপর ড্রাইবার ফেরত গিয়ে হতাশার খবর দিলো। গাড়ি গ্যারেস নেই। খবর নিয়ে সে জেনে এসেছে গাড়ি বর্ডার পেরিয়ে আগরতলায় চলছে। দুপুরে বাবার বাড়ি উঠানে উঠতেই আব্বা বেরিয়ে ডাকলেন জলদি ঘরে ঢুকে মাটিতে শুয়ে পড়। বোমারু বিমানের আওয়াজ পাচ্ছি। আব্বাতো ব্রিটিশের মহাযুদ্ধ দেখেছেন। ওনার জন্য মহাযুদ্ধতো সেই দিনের ব্যাপার মাত্র। আমরা বোমার ভয়ে অনেকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে ঘড়েথাকার পর আব্বা ডেকে নিলেন। আমার শ্বশুর আর আব্বা সুযোগ পেলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভৎসতার গল্প শুরু করতো, তাদের স্মৃতিচারণ করতো। বাপের বাড়ীতে বেশি আছি। ছেলেমেয়েরাও উন্মুক্ত জায়গা পেয়ে ছুটাছুটি আর দুরন্তপনায় মত্ত আব্বা ওদের সাঁতার শিখাচ্ছেন। আব্বা খুশি, শ্বশুর শ্বাশুড়ি চিন্তিত। তারা রাজশাহী ছেড়ে কুমিল্লায় বেয়াই বাড়িতে। কতদিন াকতে হয় কিচু বুঝা যাচ্ছে না। চরমপত্র শুনে মন চাঙ্গা করার চেষ্টা করছে সবাই। মুজিবনগরের খবর না শুনলেই নয়। সবাই উন্মুখ থাকে পরের খবর শোনার জন্য। পারভীন হোসেন এই গ্রামের বৌ ইংরেজী খবর পড়তেন। আমি খুবই গর্বিত বোধ করতাম।

দিন যায়, বসন্ত শেষ হয়, আগামী দিন আসে, আবার নীরবে চলেও যায়। সময় বয়ে যায় আপন গতিতে। সময়ের গতিতে ১লা মে মহান মে দিবস আসে। আমার বড় মেয়ে মুন্নি তার দলবল নিয়ে পেছনের পুকুর ঘাটে 'মে দিবস" পালন করে। আমার ভাতিজি টিপটিপের জন্মদিনও পালন করে মোয়া, মুড়ি, খৈ, চিড়ার নাড়ু দিয়ে। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ এক পসলা বৃষ্টির স্বাদের মতই যেন টিপটিপের জন্মদিনের আনন্দ। গ্রামের বাতাসে বারুদের গন্ধ অযা চোখ জ্বালায় ভুগছে গ্রামবাসী। গ্রাম কে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে আমাশয়, পাতলা পায়খানা,পেট ব্যাথা, রক্ত পায়খানা মহামারীর মতো। মার্শাল সিরাজমামা, গেতু মামাসহ বসে ঔষধ এর ব্যাপারে আরোচনা করতাম। কারণ গৃহস্থরা তাদের গরুর খাবারের জন্য বেশী লবণ কেনা শুরু করলে লবণের শূন্যতা দেখা দেয়। গ্রামবাসীর ঘরে ঘরে তখন বাড়তি লোকজনশহর ছাড়া আত্মীয় পরিজনরা, বাচ্চা বুড়ো যুবক যুবতী এর মধ্যেও আছে অভাব অনটন, আছে রোগ শোক। এসব কান্ড কারখানার মাঝেও নতুন শিশু জন্ম নেয়। ক'দিন আগেও শিশুর জন্ম যেখানে আনন্দ দিতো। এখন সেখানে নতুনের আগমন উৎকণ্ঠা বাড়ায়। এই নবজাতকের ভবিষ্যৎ কি। অকালে জড়ে যাবে নাতো? চারিদিকে পেটের ব্যোমো ছাড়নোতে কাঁচাকলার দামও বেড়েছে আঙ্গুর আপেলের মতো। কাঁচা কলা জাতে উঠে অভিজাত ফলের সারিতে দাঁড়িয়েছে। আমার মেঝমেয়ে (বয়স ১০ বছর) সুবা খুবনেতিয়ে পড়েছে, পাতলা পায়খানা থেকে রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হয়েছে। সাথের এন্টিবায়োটিকও শেষ। অন্যদের দিয়ে ভুল করেছি মনে হয়। নিজের মেয়ের বেলায় বাজার থেকে প্রতিদিন তিনটা করে ক্যাপসুল কিনতে হচ্ছে। যুদ্ধে দিশেহারা বাঙালী অপরদিকে রক্তের নেশায় মত্ত পশ্চিমা হায়েনা, ঠিক এমনি

দুর্দিনের এক সকাল। উঠোনে শ্বশুর উবু হয়ে বসে আছে নরসুন্দর মনাকে সামনে নিয়ে। মনিন্দ্রলাল শীল আমাদের পারিবারিক নাপিত। নাপিত সম্প্রদায় সভ্য জগতে জ্ঞানী গুণী সুশীল, বড়ই বিনয়ী। তারা সাত পুরুষ ধরে বিনয়ের সহিত বংশ পরম্পরায় এই বাড়ীর ক্ষুরকার্য সম্পন্ন করে আসছে। হঠাৎ ঝটিকা বাতাসে রৈ রৈ পড়ে গেলো, আসছে ওরা। বাড়ীর লোকজন ছুটছে জান হাতে নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে, পশ্চিমের ধানক্ষেত মাঠ-ঘাট ভেঙ্গে। আজ সুবা বড়াই কাতর। আমিতো মা। নাড়ি ছেঁড়া ধন ফেলে আমি কোথায় যাই। আর্তনাদের স্বরে শোভা বলে উঠলো মাগো! তুমি চলে যাও! শুধু এক কলসী পানি এবং একটা গ্লাস রেখে যাও, আমার আর কিছু লাগবে না। হায়রে ধরণী! যেখানে মা হয়ে আমারই সন্তান আগলে রাখার কথা, সেখানে এতটুকুন মেয়ে সুবা কিনা অস্থির হয়ে আছে মায়ের বিপদ চিন্তায়! শেষ পর্যন্ত আমার থাকা হলো না। আব্বা শ্বশুর ও বাড়ীর অন্যান্যদের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত পালাতে বাধ্য হলাম। বুক সমান ফল্যা বন (শটি বন), ধান ক্ষেত মাড়িয়ে ছুটছি। রুদ্ধশ্বাসে বুকে পাথর বেঁধে ছুটছি, বারবার ফিরে তাকাচ্ছি বসতভিটার দিকে, যেখানে শুয়ে আছে আমার অসুস্থ মেয়ে সুবা, বৃদ্ধ শ্বশুর শ্বাশুরী ও আব্বা। ফ্যাবন ছাড়িয়ে যেন কার মাথা দেখা যায়। কাছে গিয়ে দেখি নরসুন্দর মনা। কিরে মনা, তুই না বাবার শেইভ করছিলি? কাঁপতে কাঁপতে ষষ্টাঙ্গ প্রনাম করে বলতে লাগলো ফুফু আপনি যান, পালিয়ে যান। আর তুমি? ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। মোক্ষমে আছি মাগো। সুযোগ পেলে দৌঁড় দেবো। পরে খবরাখবর নিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসলাম সবাই। রাতে বৈঠক হলো, সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো এখানে থাকা নিরাপদ নয়। মুক্তিযোদ্ধা ভাইটিও আমাদের একনজর দেখার জন্য ছুটে এসেছে। বানের পানিতে ভাসমান খড়কুড়োর মতো আমরাও ভাসতে ভাসতে ভায়ের শ্বশুরবাড়ীর দিকে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় ছুটলাম। ঢাকা-চট্টগ্রাম রোড থেকে পাঁচ মাইল ভেতরে। পাক সেনা নাকি এই সীমানা অতিক্রম করবে না। সেই দুঃসময়ে আমার মতো অনেক পরিবারকেই পাড়ি দিতে হয়েছে উঠকণ্ঠা আর দুর্ভোগের দিন-রাত্রি। সেই যন্ত্রণাদগ্ধ দীর্ঘ নয় মাসের সংগ্রাম, ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা কি ভোলা যায়?

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, ঘাসফুল (এন.জি.ও), চট্টগ্রাম

লেখিকা পরিচিতিঃ

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ আধুনিক বাংলাদেশের নারীসমাজে একজন বেগম রোকেয়া। তার জন্ম রংপুরের পায়রাবন্দে নয়, তিনি কুমিল্লাতে জন্মগ্রহণ করলেও জীবনের প্রায় সর্বাংশ অতিবাহিত করেছেন চট্টগ্রামের খেটে খাওয়া জনতার সংস্পর্শে। সমাজে উপেক্ষিত ও নিগ্রীহিত জনতার পাশে দাঁড়াতে তিনি 'ঘাসফুল' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'পরান-আপা' এই নামে তাঁকে চট্টগ্রামের সুশীল সমাজের সকলেই চেনেন। তিনি আমাদের কর্ণফুলী'র একজন নিয়মিত পাঠক এবং শুভাকাঙ্খী। তিনি কর্ণফুলী'র জন্যে নিয়মিত লিখবেন, সে প্রতিশ্রুতিতে তাবৎ বিশ্বে আমাদের পাঠকদের জন্যে চট্ জলদি পাঠিয়ে দিলেন জীবনভিত্তিক এক গুচ্ছ ছোট গল্প। আমরা এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে তাঁর অপ্রকাশিত এ গল্পগুলো ছাপবো। পড়ে সুধী পাঠকদের কেমন লাগলো জানালে আমাদের ভালো লাগবে।